



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে শ্রমজীবী মানুষ

ব্রজেশ্বর দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি ঝাড়খণ্ড, ভারত

Received: 27.09.2026; Accepted: 29.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Soumitra Chattopadhyay was a multifaceted creative personality whose engagement with literature extended, directly and indirectly, across almost every major genre. Over the course of his long and distinguished acting career, he came into contact with numerous eminent personalities and earned the enduring affection, admiration, and respect of audiences and readers alike. His remarkable versatility, evident in his portrayal of a wide range of characters on stage and screen, stemmed from his deep commitment to acting and his extensive understanding of life and the world around him. His dramatic works engage with a wide spectrum of social, political, and existential concerns. The relationship between the individual and society, political instability, the crisis of existence, shifting social values, and the complexities of human relationships constitute some of the recurring themes in his plays. Within this diverse thematic framework, particular significance is attached to the lives and experiences of the working class. Their struggles, aspirations, social conditions, and everyday realities occupy an important place in his dramatic imagination. Through these representations, Chattopadhyay demonstrates not only his literary and dramatic sensibility but also his profound engagement with the social realities of his time.

Keywords: Soumitra Chattopadhyay, Bengali Theatre, Bengali Cinema, Worker, People.

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় জগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নাটক ও সিনেমায় অসাধারণ অভিনয় করার সুবাদে তিনি দর্শকমহলে জনপ্রিয়। তবে তাঁর এই অভিনেতা পরিচয়ের বাইরেও একটা পরিচয় আছে। তিনি হলেন একজন সুদক্ষ শিল্পী। শুধু অভিনয়শিল্পে নয়, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক রচনাতেও তাঁর শিল্পীসত্তার ছাপ রয়েছে। তাই যেকোনো একটি বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করা কঠিন। তাই তিনি যেমন অভিনেতা হিসেবে সর্বজনবিদিত তেমনি লেখক হিসেবেও সমানভাবে সমাদৃত। তিনি লেখার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। চলচ্চিত্র জগতের সীমাবদ্ধতাকে প্রসারিত করেছেন লেখায়। এমনকি চলচ্চিত্র জগতের বাইরে বেরিয়ে থিয়েটারে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু থিয়েটারে অভাববোধ করেছেন উৎকৃষ্ট নাটকের। প্রথাগত নাটকের সীমাবদ্ধতাকে ভাঙতে চেয়েছেন। আর এই ভাঙনেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর নাটক। থিয়েটারের প্রয়োজনে তিনি নাটক লেখা শুরু করেন। তাঁর রচিত অধিকাংশ নাটকই অনূদিত, রূপান্তর। মৌলিক নাটকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। রূপান্তর, অনূদিত হলেও নাটকগুলি প্রাণবন্ত, সাবলীল। বিদেশি অনুষ্ণে দেশীয় সমাজবাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকগুলি হল - 'বিধি ও ব্যতিক্রম' (বার্টলট ব্রেকট-এর 'এক সেপশন অ্যান্ড দ্য রুল' নাটক অবলম্বনে), 'ভুল' (আলবোয়ার কামু রচিত 'Le Malentendu' (misunderstanding নাটকের অনুবাদ), 'রাজকুমার' (ক্লিফোর্ড ওয়েটস রচিত 'দি বিগ নাইফ' নাটক অবলম্বনে), 'বৃহন্নলা' (শন

ও'কেসির 'শ্যাডো অফ এ গানম্যান' অবলম্বনে), 'টিকটিকি' (Anthony Shaffer-এর 'Sleuth' অবলম্বনে), 'নামজীবন' (এরলজন-এর 'মুন অন এ রেনবো শল' অবলম্বনে) 'আত্মকথা' (মহেশ এল্‌ কুন্‌ চওয়ার 'আত্মকথা'র বঙ্গীকরণ), 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব' (Simon Gray - এর 'The Last Cigarette' অনুকরণে নির্মিত), হালদারগোষ্ঠী (রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে), 'উত্তর পৌরাণিক' (John Millington Synge-এর 'The Wells of The Saints' অবলম্বনে)। তাঁর নাটকে কোন মতাদর্শ প্রচারিত হয়নি। নাটকে মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ মানুষ নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের মানুষ। এই সুবাদে নাটকে এমন মানুষদের মনের কথা বলেছেন যারা কায়িক পরিশ্রম করে নিজের ও তার পরিবারের সদস্যদের জীবন নির্বাহ করে। এরা শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে পরিচিত। যারা ভোর হতে না হতে নিজেদের কর্মস্থলে এগিয়ে যায়। নিজেদেরকে নিংড়ে অর্থ উপার্জন করে সংসার চালায়। তবে সৌমিত্রের শ্রমজীবী মানুষেরা শ্রেণিগতভাবে নাটকে উঠে আসেনি। তারা একক সত্তা হয়ে ধরা দিয়েছে। তাদের দুঃখ, বেদনা, ভালোবাসা, স্বপ্ন কোন একটি শ্রেণির স্বপ্ন হয়ে থাকেনি। তাদের স্বপ্ন একান্ত ব্যক্তিগত। ব্যক্তি সত্তা প্রধান হয়েছে তাঁর নাটকে।

'বিধি ও ব্যতিক্রম' নাটকে সম্পদের প্রাচুর্য তৈরি করতে অগ্রসর হয়েছে গণেশপ্রসাদ। সেজন্য সে রওনা দিয়েছে নন্দনপুর উদ্দেশ্যে। তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে কুলি, ছড়িদার। এরা দুজনেই নিজেদের শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। সে অর্থ দিয়ে সংসার চালায়। এজন্য তাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে। তারা তাদের দায়বদ্ধতায় তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী সকলকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এখানেও তারা গণেশপ্রসাদকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে তাদের কাজ নিষ্ঠার সাথে করে চলে। তবে গণেশপ্রসাদের অসংযত আচরণে ছড়িদার কাজের মাঝপথেই তাকে ছেড়ে চলে যায়। মানুষের প্রতি মানুষের অভিন্ন আচরণ ছড়িদারের ভালো লাগেনি। তাই সে উপযুক্ত জবাব দিয়ে কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। ছড়িদার সরল মনের মানুষ। তার মনে অন্যের জন্য সহানুভূতি আছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও আছে। কুলির সঙ্গে ছড়িদারের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে চেয়েছিল গণেশপ্রসাদ। কিন্তু ছড়িদার উপযুক্ত জবাব দিয়ে গণেশপ্রসাদকে পর্যদ্রস্ত করেছে। সে মানুষকে মানুষ মনে করে কুলিকে সতর্ক করেছে। সে পেশাগত পরিচয়ের বাইরে বেরিয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছে।

"ছড়িদার: ... তোমার সঙ্গে বসাটা ঠিক হয়নি। সাবধানে থেকো। লোকটা অতি বদ।... যদি পথ হারাও- আর যদিই বা বলি কেন- পথ নিশ্চয়ই হারাবে- তখন ও তোমার পান্ডুরটা কেড়ে নেবে। আর শোনো, তোমাকে রাস্তা বলে দিই।" ^১

মানুষকে নিয়ে কাজ ছড়িদারের। তাই মানুষকে মানুষ মনে করেই সব সময় সাহায্য করে গেছে। কুলিকে শুধু নয়, কুলির মৃত্যুর পর ন্যায় বিচারের আশায় থাকা তার স্ত্রীকেও সাহায্য করেছে ছড়িদার। নাটকের আরেকজন শ্রমজীবী মানুষ কুলি। কর্মের প্রতি অবিচল। সাংসারিক দায়িত্বেও দায়িত্ববান। শত অপমান সহ্য করেও সে তার পেশাদারিত্ব দেখিয়েছে। মনিবকে খুশি করতে গিয়ে সাঁতার না জানা সত্ত্বেও নদী পার করেছে। তবে তার সমস্ত ভালো মানুষই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। যে মনিবের ভালো করেছে সেই মনিবের হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। মনের সংশয়ে ভোগা মানুষ গণেশপ্রসাদ। সন্দেহের বশে নিজের ভালো করতে আসা মানুষটির সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে। কিন্তু কুলি তার স্বাভাবিক ব্যবহারের দ্বারা তাকে সবরকম সহযোগিতা করেছে। কুলির কাজে ছুটির আনন্দ ছিল। সে ভেবেছিল যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে সে তত তাড়াতাড়ি তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে। সেজন্যেই দায়িত্ববান স্বামী, স্নেহবান পিতা হওয়ার আনন্দে তার মনে গান ভেসে ওঠে। সে গেয়ে ওঠে -

"যাব নন্দনপুর যাব

সেইখানেতে বউ ছেলে আর রুজি রুটি পাব।"^২

তবে তার আনন্দ নিমেষেই শেষ হয়ে যায় গণেশপ্রসাদের ক্ষমতার আসফালনে। একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন এই কুলি।

প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে অর্থের সঙ্গে লোকবলের প্রয়োজন পড়ে। প্রতিষ্ঠানের মালিক সেজন্য পারিশ্রমিক দিয়ে লোককে তার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রাখে। প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত কাজ মালিক নিজে করতে পারেনা সেই কাজ করে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত মানুষ। কোন সময় এই মানুষ আত্মবাহ মানুষের মতো কাজ করে চলে। আবার কখনও তার মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ভাব দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানের আত্মবাহী, প্রতিষ্ঠান বিরোধী এই দুই ধরনের শ্রমজীবী মানুষের দেখা পাওয়া যায় 'ভুল' ও 'ঘটক বিদায়' নাটকে। 'ভুল' নাটকে হাওয়া বদল করতে আসা মানুষদের লুট করে হত্যা করে মা ও মেয়ে। তাদের পান্থশালার আড়ালে তারা ভয়াবহ এ কাজটি করে। এতে তাদের কোন অনুশোচনা নেই। এদের পান্থশালার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে বুড়ো চাকর। অতিথি অভাগতদের তাদের নিজেদের ভাড়া প্রদান করা ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বুড়ো চাকরের। আর মা-মেয়ের কুকর্মের একমাত্র সাক্ষী সে। তবে সে তাদের কৃতকর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করে না। সে কর্ম ও অল্পহীনতায় ভোগা একজন পুরুষ। যে পুরুষ সত্যকে উপস্থাপন করতে ভয় পায়। পাছে তাকে নিশ্চিত আশ্রয়টুকু ছেড়ে যেতে হয়। সেজন্যই হয়তো ইয়ানের মৃত্যু সংবাদ মারিয়াকে জানাতে অস্বীকার করে। শুধু আশ্রয়হীনতা নয় এর সঙ্গে অপরাধের শাস্তি কারাবাসেরও ভয় তার মধ্যে আছে। তাই অস্পষ্ট স্বরে কথা বলা মানুষটি মারিয়ার প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট করে উত্তর দেয়। তাদের এখানে আসা ইয়ানের কোন খবর তার জানা নেই। তার আচরণে মনিব প্রেম প্রকট হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা মনোভাব দেখা যায় 'ঘটক বিদায়' নাটকের মধুসূদন পাত্র ও অজিত মিত্রের মধ্যে। আটঘড়ার আড়তদার দামোদর সিংহের দোকানের হেডক্লার্ক মধুসূদন ও তার সহযোগী অজিত। তারা বিরামহীনভাবে কাজ করে। কোনও ছুটি নেই তাদের। একঘেয়ে জীবনের প্রতি তারা দুজনেই বিরক্ত। সেজন্য সপ্তাহে একটি দিন ছুটি প্রার্থনা করে। কিন্তু তাদের এই ছুটি মঞ্জুর হয় না। নিজেদের প্রতি নিজেরাই তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। এমন জীবন তাদের ভালো লাগে না। অন্যদের মতো তাদেরও হাসিখুশি জীবন উপভোগ করার স্বাদ জাগে। কিন্তু অর্থের বেড়ি তাদের আনন্দের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে এবারে দামোদরের কাছে অপমানিত হয়ে তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে। দামোদরের দোকানের লাভ লোকসানের হিসাব ভুলে জীবনের লাভ লোকসানের দিকে নজর দেয়। অফুরান আনন্দের জন্য তারা তাদের অদেখা শহরকে দেখার বাসনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মজা, হৈ-হুল্লোড় করে জীবন কাটাবে। তাদের এতদিনের আরও একটি স্বপ্ন মেয়েমানুষকে কাছে থেকে দেখার। সেই স্বপ্নকেও তারা পূরণ করতে বেরিয়ে পড়ে। তারা জীবনটাকে উথাল-পাথাল করে দিতে চায়। তারা স্বপ্ন দেখে সাধারণ কর্মচারীর থেকে ব্যবসায়ী মানুষ হওয়ার। শ্রমের বিনিময়ে অন্যের দোকানে যে কাজটি তারা এতদিন করে এসেছে সেই কাজটি নিজেদের জন্য করতে চায়। সাধ বড়লোক হওয়ার। বড়লোকদের মত জীবন উপভোগ করতে চায়। তবে গরিব মানুষের সদগুণগুলো বাদ দিয়ে নয়। এত রকম চিন্তা চেতনার মধ্যে তাদের যে চিন্তাটা সবার আগে নাড়া দিয়েছে সেটি পেটভরে খাবার চিন্তা। বড়লোক হলে আর যাই হোক পেটটা ভরে খাওয়াটা হবে - এই আশা তাদের মধ্যে আছে। মধুসূদন গরিবের কি যন্ত্রনা তা বুঝেই বলে উঠেছে-

"না তা হয়তো হব না... তবে সবথেকে ভাল হত যদি কেউ গরিবের যা যা সদগুণ সেইগুলোও পেত আর সেইসঙ্গে বড়লোকের খাওয়াদাওয়া আমোদ-আহ্লাদের যা যা সুখ আছে সেইগুলোও পেত। ... যাকগে বড়লোক হলে অন্তত পেটটা ভরবে তো।"^৩

এই ইচ্ছায় তারা বেরিয়ে পড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। ঘটনাচক্রে তারা দুই নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাদের ভালোবেসে ফেলে। সব রকম প্রতিকূলতাকে জয় করে শ্রমজীবী মানুষের সামান্য ইচ্ছার সমস্ত কিছুই লাভ করে।

প্রতিষ্ঠানের আরও এক ধরনের শ্রমজীবী মানুষেরা আছে যারা তাদের শ্রম দিয়ে চলে। বড় বড় রেস্টোরাঁ, হোটেলে আগত মানুষদের খাবার পরিবেশন করে এই ধরনের শ্রমজীবী মানুষেরা। আগত মানুষদের রুচি মতো তাদের যত্ন করে। যত্নশীল ব্যক্তির প্রতি আগত মানুষদের অনুগ্রহ দেখা যায়। এই যত্নশীল ব্যক্তির মূলত খাবার পরিবেশক। যারা হোটেল, রেস্টোরাঁয় আগত মানুষদের খাবার পরিবেশন করে। এই ধরনের শ্রমজীবী মানুষকে 'প্রতারণা' নাটকে দেখা যায়। ওয়েটার এই শ্রমজীবী মানুষ। সে তাদের হোটеле আশা মানুষদের যত্ন নিয়ে থাকে। বিনিময়ে পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু টাকা এই মানুষদের কাছ থেকে পায়। অরিন্দম রজত যখন হোটেল খেতে যায় তখন তাদের পরিচয় হয় ওয়েটারের সঙ্গে। সহজ সরল স্বভাবের মানুষ ওয়েটার। সেজন্য রজতদের আলোচনায় অনধিকার প্রবেশ করে। তাদের আলোচনায় প্রবেশ করলেও সে তার পাহাড়ি সরলতায় তাদের মন জিতে নেয়। শ্রমজীবী মানুষের যেমন সরলতা থাকা দরকার ওয়েটারের মধ্যে সেই রকম সরলতা দেখা যায়। সারল্য মানুষকে মানুষের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলে। যে বিশ্বাস শ্রমজীবী মানুষকে কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করে। ওয়েটারের ক্ষেত্রে তার আচরণ তাকে সাহায্য করেছে।

যারা সামান্য পুঁজি নিয়ে দোকান চালায় তারাও শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ। তারা সামান্য পরিমাণ লাভে নিজেদের পণ্য বিক্রি করে সংসার চলে। এই আয়ে নিজে আবার স্বপ্ন দেখে সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ করার। যাতে করে তার সন্তানকে তার মতো পরিশ্রম করতে না হয়। প্রত্যেক পিতা সন্তানের জন্য এই স্বপ্নই দেখে। যে তার সন্তান মানুষের মত মানুষ হচ্ছে। 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে' নাটকে এমনই একজন স্বপ্নসন্ধানী পিতাকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। দাশু মুদি দোকানদার। সামান্য রোজগার করে সংসার চালায়। সন্তানদের নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তবে প্রত্যেক পিতার মতো তার মধ্যেও সন্তান স্নেহবৈষম্য দেখা যায়। কন্যার প্রতি যে স্নেহ তার থেকে বেশি স্নেহ তার পুত্রের প্রতি। এই স্নেহের বশে সে তার পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে প্রস্তুত। তার জন্য তাকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে সেই পরিশ্রম করতেও সে দ্বিধাহীন। সে চাইনা তার সন্তানেরা অন্যের অনুগ্রহে বেঁচে থাকুক। তাই তো তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ -

"... লোকের কাছে দয়া চেয়ে বেঁচে থাকতে আমার ঘেন্না করে।"^৪

পরিশ্রমী মানুষ সে। পরিশ্রম করতে তার ভয় নেই। পরিশ্রমের ফসল অন্য কেউ নিয়ে যাক তাও সে পছন্দ করে না। তার হিসেব সহজ। পরিশ্রম করো ফল পাও। বিনা পরিশ্রমে কোন কিছু আশা করেনা দাশু। নিজেরটা যেমন সে বুঝে নেয় তেমনি অন্যকেউ সে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়। কোনরকম অসৎ উপায় সে অবলম্বন করে না। নিখাদ মানুষ সে। নিজের ও পরিবারের ভালোর চিন্তায় করে চলে প্রতিনিয়ত।

ব্যবসায়ে সততা থাকা অত্যন্ত জরুরি। হোক না সে ব্যবসা ফেরিওয়ালার। তাতে কোন যায় আসে না। ব্যবসায়ের সততা মেলে ধরেছেন 'সেরিবা-সেরিবান' নাটকে। দেশে দেশে ঘুরে পসরা বিক্রি করার কাজ সেরিবা ও সেরিবানের। তারা দুজনে সব সময় একসঙ্গেই পসরা নিয়ে ফেরি করতে বের হয়। এরা দুজন দুজনের বিপরীত। কেউ চাই লোক ঠকিয়ে মুনাফা লুটতে, আবার কেউ চায় সৎপথে জীবন কাটাতে। একই

গ্রামের একই বাড়িতে পরপর তারা তাদের পসরা নিয়ে হাজির হয়। একজন লোভের বশে সোনার পাত্রকে সামান্য পাত্র বলে বাড়ির মালিককে ঠকানোর ফন্দি আঁটে। আর একজন সোনার পাত্রকে সোনার পাত্র বলে নিজের সমস্ত পসরা দিয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তারা দুজনে সততা নিয়ে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। তবে কোনভাবেই সেরিবা তার লোকঠকানোর ফন্দি থেকে বেরিয়ে আসে না। সে জানায় -

"দেখো সেরিবান, ব্যাবসা করবে আর লোককে কখনওই ঠকাবে না এ হয় না। ভগবান যাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, সে সেই বুদ্ধি ভাঙিয়ে যেন তেন প্রকারেণ দুটো পয়সা করবে এই হল ভগবানের বিধান। নইলে আর বুদ্ধি দেওয়া কেন?"^৫

ভগবানের দোহাই দিয়ে লোক ঠকাতে মরিয়া হয়ে ওঠে সেরিবা। কিন্তু নিজেই ঠকে প্রাণ ত্যাগ করে। অন্যের জিনিসে লোভের বশে সেরিবা নিজের লোকসান করে। শেষ পর্যন্ত হতাশায় প্রাণটা চলে যায়। শ্রমজীবী মানুষ লোভী হয়ে নিজের জীবনটাই বিকিয়ে দেয়।

কারখানায় নিজের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সংসারের জন্য কাজ করে চলে শ্রমজীবী মানুষেরা। তপ্ত লোহাকে ঠান্ডা করা হোক বা ঠান্ডা লোহাকে তপ্ত করা হোক সে কাজ নির্দিধায় করে চলে শ্রমজীবী মানুষেরা। পরিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা এ কাজ হাসিমুখে করে। কাজের অনুপ্রেরণা তারা তাদের পরিবারের থেকেই পায়। পরিবারের আবদারে তারা অতিরিক্ত পরিশ্রমেও ভয় পায় না। এমনই কঠোর পরিশ্রমের মানুষ 'নামজীবন' নাটকের বিশ্ব ও অমরনাথ। অমরনাথ কারখানার শ্রমিক। সামান্য বেতনের কর্মচারী। কিন্তু সন্তানের প্রতি সীমাহীন স্নেহের বসে সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে। মেয়ে রুনি পরীক্ষায় ভালো ফল করায় পিতা অমরনাথ তাকে তার পছন্দের জিনিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেইমতো সে সংসার খরচ বাদে অতিরিক্ত অর্থ রোজগারের চেষ্টা করে। কারখানার কাজের বাইরে নিজের প্রতিভার কাজ করে। এককালের নামকরা ক্রিকেটার এখনকার উঠতি ক্রিকেটারদেরকে পরামর্শ দেয়। তাদের ব্যাট মেরামত করে দেয়। তার বিনিময়ে সে পায় সামান্য অর্থ। যে অর্থ জমিয়ে সে তার মেয়ের ইচ্ছাকে পূরণ করতে চায়। তবে তার অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়। উপায় না পেয়ে মালিকের অর্থ চুরি করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে বিশ্ব মোটর মেকানিক। আয় খারাপ নয়। তবে তার আয় করার উদ্যম নেই। কেননা যার জন্য তার রোজগার করা সেই ভাই অকালেই তাকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছে। এজন্য সে কাজ করার কোন উৎসাহ পায় না। উৎসাহ না পেয়ে এ দেশ ত্যাগ করার মতো সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রমজীবী মানুষের কাজে নিজেকে বাঁচানোর থেকেও পরিবারকে বাঁচানোর তাগিদ বেশি। এজন্য এক তাগিদে অমরনাথ নিজের আয়ের অতিরিক্ত আয় করতে চেয়েছে আরেকজন বিশ্ব তাগিদ ছাড়া কাজ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তবে অমরনাথ তার সংসার এবং বিশ্ব তার ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেয়ে কাজ করার নতুন উদ্যম পেয়েছে। যে উদ্যম তাদেরকে উদ্যোগী কর্মচারী করেছে। কেউ স্বতন্ত্র কাজে যুক্ত হয়েছে আবার কেউ নতুন কাজের সন্ধান করেছে।

কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা নিজের শ্রমকে বিক্রি করেছে কর্পোরেট সংস্থায়। প্রতিনিয়ত নিজেদের মানসিক অবস্থার অবনতি করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করেছে। এমন শ্রমজীবী মানুষেরা ধরা দিয়েছে সৌমিত্রের 'টাইপিস্ট' নাটকে। নাটকের ইন্দ্রাণী ও অনিরুদ্ধ নিজেদের মানসিক অবস্থাকে অবদমিত করে অনবরত কাজ করে গেছে। এক্ষেত্রেও তারা তাদের পরিবারের দিকে তাকিয়েই কাজ করে চলেছে। অনিরুদ্ধ স্ত্রী, সন্তানকে সুখী করতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছে। আর ইন্দ্রাণী নিজের মাকে বাঁচিয়ে রাখতে কাজ করে চলেছে। দুজনেই মানসিকভাবে দুর্বল। অনেকবার কাজ ছাড়া হুমকি দিয়েও কাজের বাজারের অপ্রতুলতায় সে সিদ্ধান্তকে তারা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের উৎপীড়ন দেখা গেছে তাদের মধ্যে।

"অনিরুদ্ধ: রানি, যদি চাকরিটা ফেরত পাই- তা হলে দেখবে আমি বদলে গেছি। দেখবে অনিরুদ্ধ হালদারের ছেলেমানুষি কেটে গেছে।"^৬

কাজের মূল্যায়ন ভালো আচরণে- এই বোধ গড়ে তুলেছে শ্রমজীবী মানুষের মন। তাই শত অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষকে ভালো আচরণ করতে হয়। মানুষের বিশেষ করে ধনী মানুষের সাহায্যে একশ্রেণির মানুষেরা তাদের শ্রমকে বিক্রি করেছে। এরা মূলত ধনী বাড়ির অন্দরমহলে শ্রমজীবী মানুষ। তারা কেউ গৃহভৃত্য, কেউ দারোয়ান, কেউ ঝি। যারা বাড়ির অন্দরমহলে নিয়ন্ত্রণ রেখেছে তাদের দায়িত্ব। এমন ধরনের শ্রমজীবী মানুষেরা দেখা দিয়েছে সৌমিত্রের নাটকে। 'নীলকণ্ঠ' নাটকের দাশরথি খান, বিন্দুবাসিনী, নগেন্দ্র এরা সকলেই বাড়ির অন্দরমহলের রক্ষা কর্তা। যাদের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাড়ির অন্দরমহল একেবারে অকেজো। এরা তাই স্নেহের বশে পরিবারের মানুষদেরকে নিজেদের আত্মীয় মনে করে। তবে এর বাইরে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তাদের মধ্যে কাজ করে। নতুন আগত তাদের স্থানীয় কর্মচারী তাদেরকে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে। স্নেহের আচরণ কর্মের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে। এ নাটকের দাশরথি খান ও বিন্দুবাসিনীর ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। কলকাতা থেকে আগত নতুন কর্মচারী নগেন্দ্র পুরনো কর্মচারীদের তাদের অবস্থান নির্দেশ করলে মানবিকতা ছোট হয়ে যায়।

'আরোহন' নাটকের বামুনদি অমিতাভ ও মধুমিতার বাড়ির গৃহকর্মের সহযোগী। সে বাড়ির একজন। হাসি ঠাটা মশকরাতে বাড়ির সকলের সাথে মিলেমিশে থাকে। বাড়ির কর্মচারী বলে তাকে মনে হয় না। সেজন্যই হয়তো মধুমিতার ছোট বৌদি ছায়ার সাথে খুনসুটি করতেও তার কোন দ্বিধা নেই। শ্রমজীবী মানুষেরা সব সময় কর্মস্থলের পরিবেশ নিয়ে সচেতন থেকেছে। যেখানে পরিবেশ অনুকূল হয়েছে সেখানে কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। যেখানে প্রতিকূল পরিবেশ সেখানে কাজ করা মুশকিল হয়েছে। 'আরোহন' নাটকে প্রতিকূল পরিবেশ পেয়ে বামুনদি নিজের কাজের মাত্রাকে বাড়িয়েছে। সাহস পেয়েছে পরিবারের কর্তাদের ভালো-মন্দ খোঁজ নেওয়ার। এমন শ্রমজীবী মানুষেরা আছে যারা আংশিক সময়ের শ্রমজীবী মানুষ। পরিবারের প্রয়োজনে তারা পারিবারিক কাজ মিটিয়ে অর্থের রোজগারের সন্ধান করে। 'কুরবানি' নাটকের গঙ্গামণি এই ধরনের একজন শ্রমজীবী মানুষ। যে চেকপোস্টের পুলিশদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। চেকপোস্টে যখন নারী অপরাধী ধরা পড়ে তখন তার ডাক পড়ে। কেননা চেকপোস্টে কোন নারী নিরাপত্তা কর্মী নেই। তাই নারীকে তল্লাশির জন্য সে উপস্থিত হয়। বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক পায়। তবে মানুষ হিসেবে সে অত্যন্ত সরল মনের। স্বামী পরিত্যক্তা জোহরা আলম ধরা পড়লে সে তার তল্লাশি নিতে চেকপোস্টে হাজির হয়। জোহরার অবস্থা দেখে তার মায়া হয়। শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরে সে জোহরাকে সান্তনা দিয়ে তার মানসিক অবস্থার উন্নতি করতে পারেনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে শ্রমজীবী মানুষেরা বহুমাত্রিক দিকটি লক্ষণীয়। তাঁর নাটকে মানুষেরা কখনও নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে সামাজিক অবস্থান বদলাতে চেয়েছে। আবার কখনও কর্মের প্রতি উদাসীনতায় নিজের অবস্থার অবনতি দিকে নিয়ে গেছে। কখনও নিজের বিগত দিনের অবস্থানের কথা অন্যকে বলে নিজের দুঃখ হালকা করেছে। বলা যেতে পারে সৌমিত্রের নাটকের শ্রমজীবী মানুষেরা নিজেদের স্বাধীন সত্তার ও আত্মপরিচয়ের আকাজক্ষা নিয়ে ধরা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ১। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫। পৃষ্ঠা ১৩।
২. তদেব। পৃষ্ঠা ১৫।
৩. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ২। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫। পৃষ্ঠা ৩২।
৪. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ১। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫। পৃষ্ঠা ৩৬১।
৫. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ২। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫। পৃষ্ঠা ৬।
৬. তদেব। পৃষ্ঠা ৪৭০।